মোদীর সফর ও তিস্তা প্রসঙ্গ

| ড. আইনুন নিশাত |

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে অভিন্ন নদীগুলো আছে তার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা যে এপ্রোচ নেয়া উচিত সেটি হচ্ছে অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ একটি নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে নদীটি যেখানে শেষ হয়েছে পুরো দৈর্ঘ্যটা এবং পুরো অববাহিকাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পনায় আসতে হবে। পৃথিবীর সকল অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা যারা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পড়াই আমরা যেসব টেক্সট বই কিংবা আন্তর্জাতিক নদী সম্পর্কে যতো তথ্য আছে, যতো দলিল আছে, যতো থিওরি আছে, যতো প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে সবগুলোতেই এই নীতি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। আনফরচুনেটলি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরে, ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির পরে তদানীন্তন পাকিস্তান পূর্ব অংশের দিকে তেমন নজর দেয়নি এবং অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। অথচ পশ্চিমাংশে সিন্ধু নদীর পানির ব্যবস্থাপনা তারা সঠিকভাবেই করে নিয়েছে। সিন্ধু এবং তার পাঁচটি উপনদী অর্থাৎ ছয়টি নদীর পানি তারা পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ তিন নদীর পানি ভারত নিয়েছে, তিনটি নদীর পানি পাকিস্তানকে দিয়েছে। সেই সাথে ভারত এবং পাকিস্তান তার অংশে তাদের তিনটি নদীর পানি ছয়টি নদীর অববাহিকায় বিতরণ করে সমস্যাটির সমাধান করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৫১ তে তিস্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, ৫২'তে গঙ্গা নদী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং নজরটা ছিল শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টনের বিষয়ে। যদিও ১৯৭২ সালে যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয় তখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বন্যার কথাটা বার বার চলে এসেছে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত দুই দেশের অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি তবে গঙ্গা এবং তিস্তাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দুই দেশে প্রকল্পের মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় করা যায় কিনা তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অগ্রগতি হয়নি। এ প্রসঙ্গে বোধহয় বলা সঠিক হবে যে, বাংলাদেশে যারা কর্তাব্যক্তি ছিলেন তাদের কাছে মূল নজরটা ছিল বন্যার সময় কি হবে, বন্যার সময় প্রাচুর্যতা তাদের কাছে সমস্যা ছিল কিন্তু পানির ঘাটতিটা তাদের কাছে সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। মনে রাখতে হবে, ৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত আমন ধানটি প্রধান ছিল এবং আমন ধানের মৌসুমে প্রধান সমস্যা ছিল ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বিষয়ে ততোটা জোর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় ছিল না। এই পর্যায়ে ১৯৭৫-এ যখন ভারত ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করলো তখন হঠাৎ করে আমরা দেখলাম গঙ্গানদী শুকিয়ে গেছে। খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা তীব্রভাবে বেড়ে গেছে এবং আমরা শুকনো মৌসুমে সমাধানের দিকে পা বাড়ালাম। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হচ্ছিলো এবং এখনো সেই প্রস্তাবটি বহাল আছে। আমি মনে করি, প্রস্তাবটি সঠিক। সেটি হলো—গঙ্গা নদীর উজানে অববাহিকাতে জলাধার নির্মাণ করে বর্ষার পানি ধরে রেখে শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ বাড়ানো। এতে করে বর্ষায় বন্যার প্রভাবটাও কমবে এবং প্রচুর পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। একই প্রক্রিয়া বাংলাদেশ তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে প্রস্তাব করেছিল।

এখন আমি বর্তমান সময়ে চলে আসি। দুটি পয়েন্ট। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ২০১১ সালে ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে সেখানে দুই নম্বর ধারাতে বলা হয়েছে, নদী ভিত্তিক এবং অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এটাই হচ্ছে আধুনিক চিন্তা। আর দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, শুকনো মৌসুমে পানিটা আমরা আপাততো ভাগ করে নেই এবং দীর্ঘমেয়াদীতে আমরা সারা বছরের চিন্তা করবো। এই লক্ষ্যে আমরা দেখেছি ২০১১তে শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টনের একটি খসড়া দুই দেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতার কারণে সেটি ২০১১ সালে চূড়ান্ত হয়নি এবং এখনো ঝুলে আছে।

আমার কথা হচ্ছে, ২০১১ সালে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেটাকে ধরেই এগোতে হবে। তবে যদি শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টনের একটি চুক্তি হয়ে যায় এটাকে আমি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি বলবো। কারণ সারা বছরের পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করে ফেলতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন এই কারণে যে, এখন শুকনো মৌসুমে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় ৫০০০ কিংবা ৬০০০ কিউসেক সেটা ভারতের চাহিদার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। আর বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় অর্ধেকের মতো। কিন্তু এই নদীগুলোর উপরে বাংলাদেশের স্বাভাবিকভাবেই একটি অধিকার আছে। প্রথম পর্যায়ে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এবং পরবর্তীতে যৌথভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোতে হবে। সেই আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনটি বিষয়ে। প্রথমত, বর্ষার সমস্যা। তিস্তা নদী কিন্তু বর্ষাকালে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তিস্তার দুই পাড়ে প্রচণ্ড বন্যা হয়। বন্যা, নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধ প্রায়ই নদীর চাপকে ঠেকাতে পারে না। অর্থাৎ বর্ষার পানিটা ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে ভাটিতে বন্যার চাপটি কমে যাবে এবং বন্যার সময় যে প্রচণ্ড নদী ভাঙন হয় তিস্তা অববাহিকাতে সেটির প্রকোপও কমে যাবে। আমরা লক্ষ্য করছি, ইতোমধ্যে ভারতে তিস্তার উজানে সিকিম প্রদেশে অনেকগুলো পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এইগুলোকে 'বান অব দ্যা রিভার' হিসাবে ডিজাইন করা হচ্ছে। এইগুলোতে জলাধার নেই বললেই চলে। এই ডিজাইনটিকে দুই দেশ একত্রিত করে যদি পরিবর্তিত করে উপযুক্ত আকারের জলাধার নির্মাণ করে তাহলে পশ্চিম বঙ্গ শুকনো মৌসুমে উপকৃত হবে। বাংলাদেশও শুকনো মৌসুমে উপকৃত হবে। কারণ বাড়তি পানি পাওয়া যাবে। একই সাথে বাংলাদেশ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এবং প্রচুর পানি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। তাহলে বর্ষাকালে সমস্যাটা অবিলম্বে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে আমন যেটাকে আমরা ধানের সিজন বলি ভারতে বলা হয় খরিদটু। এই সিজনে পানির বিষয়টা বলা যেতে পারে ১৯৪১ সালে তিস্তার পানি ব্যবহার বিষয়ে বৃটিশ শাসন আমলে যখন দার্জিলিং-এর কাছে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি চূড়ান্ত করা হয় তখন কিন্তু প্রকল্পটি ছিল আমন মৌসুমে সাপ্লিজেন্ট্রি ইরিগেশনের জন্য এই প্রকল্পটি ছিল। অর্থাৎ দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট এবং তৎসংলগ্ন ভারতের এলাকাতে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে পানির ঘাটতি পূরণই কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল। বলা বাহুল্য তখন বোরো ধানের প্রচলন ভারত কিংবা বাংলাদেশের কোনোটাতেই হয়নি। খুব অল্প কিছু জায়গাতে বিলের পাশে বোরো ধান হতো। তাহলে ভারতের সাজলডোবার ব্যারাস্টি, বাংলাদেশের ডালিয়ার ব্যারাস্টি দুটোই হচ্ছে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ দেয়ার প্রকল্প। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে মোটামুটি প্রয়োজনের মতোই পানি থাকে। এটা যাতে দুই দেশই নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই বণ্টন ব্যবস্থা সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর কার্যকর থাকলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। খসড়া চুক্তি, সেটা দুই দেশে অনুস্বাক্ষর করেছে সেটি যেহেতু আমার দেখার সুযোগ হয়নি এবং এর কনটেন্টও আমি জানি না কাজেই আমি আশা রাখবো সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের কথাটি মাথায় রেখেছেন। এর পরে আসছে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত, শুষ্ক মৌসুম, যখন পানির প্রবাহ কমতে কমতে পাঁচ-ছয় হাজারে এসে পৌছায়। যদি আমার প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী জলাধার নির্মাণ করা হয় তাহলে এই ছয় হাজার কিউসেককে বাড়িয়ে কুড়ি, বাইশ, চব্বিশ হাজার কিউসেকে পৌছাতে পারলে দুই দেশেই শুকনো মৌসুমে পানির সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। যতোদিন তা না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে দুই দেশের মধ্যে বণ্টন করে নেয়া যেতে পারে। রাজনৈতিকভাবে বণ্টনের কথা বলছি এই কারণে, এই বণ্টনে বিশ্বস্বীকৃত কোনো ফর্মূলা নেই। আমি একজন প্রকৌশলী আমাকে যতো পানি দেবেন আমি ততো তার ব্যবহার বাড়াবো। আমাকে যতো পানি দেবেন আমি ততো জমি সেচের আওতায় আনতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে যদি ফিফটি/ফিফটি ভাগ করা হয় তাহলে আমার বক্তব্য থাকবে, নদীর কথাটি মনে রাখবেন। প্রতিবেশের কথা, নদীর নিজস্ব ডিমান্ডের কথা বলা শুরু করেছি। ভারতের অভ্যন্তরের ব্যাপারেও কিন্তু এই কথাটা জোরের সাথে বলা হয়। ডালিয়া ব্যারেজের ভাটিতেও যেনো কিছু পানি ছাড়া হয়। রাজনৈতিক নেতারা যে সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছেন যেটা ইতোমধ্যে অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। আমার মনে হয়, সেটি রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহলে এখন মোদী সাহেবের সফর কেনো হচ্ছে না। আমি

এরপর দেখুন ২৩ পৃষ্ঠায়

মোদীর সফর ও তিস্তা প্রসঙ্গ

২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

টেলিভিশনে মোদী সাহেব এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন কথাবার্তা শুনে বুঝেছি এবং আমি বিশ্বাস করি ভারত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে অত্যন্ত আগ্রহী। বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার বক্তব্য মোটামুটি তাই। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা দুটোকে আলাদাভাবে দেখা উচিত। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তদানীন্তন পাকিস্তান মার্কিন জোটের সাথে ওঠাবসা করতো। ভারত রাশিয়ান জোটের সাথে বন্ধুত্ব রেখে জোট নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি গড়ে তুলেছিল। এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এ সমস্ত জোটের কোনো ভ্যালু নেই। এখন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কথাই বলি আর বৈদেশিক আগ্রাসনের কথাই বলি এটা এখন বড় ইস্যু না। এখন আমি অর্থনীতিতে যতো শক্তিশালী হবো আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ততো দৃঢ় হবে। বহির্বিশ্বে ততো সম্মান অর্জন করতে পারবো। কোনো জগতেই ভিখারীদের কোনো সম্মান নেই। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পৌছানোর আশা করছি এবং আমরা পৌছাতে পারবো। অর্থাৎ ভিখেরীর যে চেহারা ছিল সেটি থেকে আমরা সরে যেতে পারবো। এর জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। দুই দেশের মধ্যে যতোগুলো জটিলতা আছে এগুলো মূলত কিন্তু রাজনৈতিক কেন্দ্রিক। এই রাজনীতিগুলোকে একটা একটা করে যদি সরিয়ে ফেলে অর্থনৈতিক যোগাযোগের দিকে এগিয়ে নেয়া যায় তাহলে কিন্তু এই কাজটি সম্ভব হবে। যেমন ভারতে যে পরিকল্পনা হচ্ছে, এলাহাবাদ কানপুর থেকে ফারাক্কা দিয়ে তারা হলদিয়া বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য নৌ পরিচালনা করবে। আমি চাইবো এটি আর একটু প্রসারিত করে মংলা বন্দরকেও ঐ কাজের সাথে সংযোগ করা হোক। আজকে কিন্তু আমরা জুন মাসে কথা বলছি, একটা বার্জ নারায়ণগঞ্জ থেকে জঙ্গীপুর ক্যানেলে লক গেটের ভেতর দিয়ে ভাগীরথিতে পৌছে ফারাক্কার লক গেটের মাধ্যমে উজানে এলাহাবাদ যেতে পারে। গত বছর আসামে কিছু সড়ক নির্মাণ সামগ্রী গেছে। এই পথেই আরিচাতে এসে সোজা গোহাটি পৌছে গেছে। অর্থাৎ নদীগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নৌ পথগুলোর দুরবস্থা থাকলেও আজ কিন্তু বর্ষা মৌসুমে নৌপথ ব্যবহায় চলাচল করা সম্ভব। তিস্তাকে কেনো আমরা নেভিগেশনের কথা চিন্তা করছি না। আমরা ধরলা দুধকুমারে যদি নেভিগেশন করতে পারি, যদি বছরের অল্প সময়েও করতে পারি তাহলে কিন্তু গোটা ভারত-বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। আমি এ কথা বলে শেষ করছি, তিস্তাতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ভারত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিস্তা নদীর কাঙ্ক্ষিত সমাধান করতে পারছে না। তবে আমরা আশা করবো মোদী অভ্যন্তরীণ সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলতে পারবেন এবং ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের প্রশ্নে প্রধান বাধা সরাতে পারবেন। এটা হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে বিশ্বস্ততা /ট্রাস্ট এটা গঠনে কিন্তু বাধা সৃষ্টি করছে। দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হলে একটা বড় রাজনৈতিক সমাধান হবে। এই বিষয়ে কিন্তু জটিলতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে এবং এই তদানীন্তন পাকিস্তান আমল থেকেই এ বিষয়ে আলোচনা চলছে, যেটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল '৭৪ এ। '৭৪ থেকে ২০১৫ এই দীর্ঘ সময় লাগলো একটি সিদ্ধান্তে পৌছানোর পরও তা বাস্তবায়নের জন্য। আশা করি, তিস্তার ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেয়া আছে সেটা বাস্তবায়নে আর দীর্ঘসূত্রিতা থাকবে না। দুই দেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব অর্জন করলে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি হলে বিশ্বের দরবারে আমাদেরও দাম বাড়বে। আমাদের মুখও উজ্জ্বল হবে। আমাদের সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে এবং এর অর্থনৈতিক সহযোগিতাতে যে সকল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে আমি আশা করি, সেটা সফল হবে এবং রাজনীতিবিদদের এ বিষয়ে দূরদর্শী পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

লেখক : ভিসি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়